ভূমিকা

বাংলা গদ্যরীতির ব্যবহার আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। মধ্যযুগের অনুবাদকাব্য মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য জীবনীকাব্য, মুসলমান কবিদের রোম্যান্টিক প্রণয় কাব্য প্রভৃতির সাহিত্যিক ছন্দোবদ্ধ ভাষার সমান্তরালে বিভিন্ন চিঠি-দলিল-হিসাবপত্রে স্তরে স্তরে গদ্য-ভাষাও বিবর্তিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মধ্যযুগের বাংলা ভাষার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের চেষ্টা অনেকবার হয়েছে কিন্তু সে প্রচেষ্টা সীমায়িত থেকেছে মূলত সাহিত্যধর্মী আলোচনার মধ্যেই। এরপাশাপাশি চিঠি-দলিল-হিসাবপত্র ইত্যাদির গদ্য-ভাষার এককালিক অবস্থান ও কালানুক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের অভাব থেকে গেছে। এরই সূত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক স্বরূপ তথা গদ্যের আকর সন্ধানের প্রয়োজনে তৎকালীন চিঠি-দলিল-হিসাবপত্রকে উপাদান হিসাবে বেছে নিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনার বিষয়টিকেই গবেষণাকর্ম হিসাবে নির্বাচন করেছি।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সাহিত্যিক উপাদানগুলি ছন্দোবদ্ধ হওয়ায় এগুলির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে; বিশেষত পদ্যের কাঠামোয় অতন্দ্র বুদ্ধিজাত সতর্ক ও শাণিত চিন্তা যথোপযুক্ত ভাবে প্রকাশিত হতে পারে না কারণ কাব্যশৈলীর প্রকাশভঙ্গি মূলত আলঙ্কারিক — কিছুটা কৃত্রিমও বটে। একমাত্র গদ্যের হলকর্ষণেই মানব মনের যথার্থ প্রকাশমুক্তি ঘটে এবং ভাষাশৈলীর সাবালকত্ব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যিক উপাদান অবলম্বনে মধ্যযুগের কাব্য-ভাষা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা গেলেও একমাত্র চিঠি-দলিল-হিসাবপত্র ইত্যাদির ভাষা অবলম্বনেই গদ্য-ভাষার প্রাগাধুনিক রূপ পর্যালোচনা সম্ভব। সেই সঙ্গে উক্ত নিদর্শনগুলি অবলম্বনে আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো সন্ধান করা যায়।

ইতিপূর্বে চিঠি-দলিল বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই, তবে তা ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচিত, সংকলিত। শিবরতন মিত্রের Types of Early Bengali Prose, সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন, পঞ্চানন মণ্ডলের চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (দুই খণ্ড), শাহজাহান মিয়ার পুরানো বাংলা দলিলপত্র, দেবেশ রায়ের আঠারো শতকের বাংলা গদ্য, সুধাংশু শেখর তুঙ্গের বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা, আনিসুজ্জামানের পুরোনো বাংলা গদ্য, Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Librery & Records, দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, মোহিত রায়ের নদীয়ার সমাজচিত্র, পূর্ণেন্দুনাথ নাথের বাংলা ভাষায় আইন চর্চার ধারা প্রভৃতি গ্রন্থে কিছু চিঠি-দলিলের পাঠ ও তদ্বিষয়ক আলোচনা আছে কিন্তু সেখানে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার পরিসর খুবই কম। অবশ্য অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলনের (১ম খণ্ড) ভূমিকায় এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (৫ম খণ্ড) চিঠিপত্রের গদ্য সম্পর্কিত আলোচনা আছে অনেকটাই।

যাইহোক পুরানো বাংলা চিঠি-দলিল নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও ভাষাতত্ত্বের এককালিক দৃষ্টিকোন থেকে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত

হয়নি। আমাদের এই গবেষণা প্রকল্প সেই বিশেষ দিককে পূর্ণ করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

আমরা এই গবেষণায় ১৫৫৫-১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত চিঠি-দলিল-হিসাবপত্রকে নির্বাচন করেছি। ব্যক্তিগত সংগ্রহের নথির পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত নথিও এক্ষেত্রে নির্বাচিত হয়েছে। সংকলিত নথির অধিকাংশই তারিখযুক্ত; তবু তারিখবিহীন কিছু নথিও এই গবেষণাকর্মের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। তারিখবিহীন এই নথিগুলি প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাসিওনেল এর সম্পত্তি। সংগ্রাহক অসাঁ। 'ইনি ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগরের ফরাসি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অনুবাদক ছিলেন।' (বাং.গ,পৃ.৮/ভূমিকা)। এই সংগ্রহের মধ্যে লেখা আছে 'Secretair Bengaly / 1779 / Vol 1A / MS INDIAN 79' সুতরাং নথিগুলি ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ বা তার পূর্বে সংগৃহীত বলে ধরে নেওয়া যায়।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের নথির পাশাপাশি গ্রন্থে প্রকাশিত নথিগুলিই আমাদের আলোচনার অন্যতম প্রধান উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, বিবলিওথেক ন্যাসিওনেল, ভারতীয় মহাফেজখানা, বিশ্বভারতী, বর্ধমান সাহিত্যসভা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছু চিঠি-দলিল-হিসাবপত্র সংরক্ষিত হয়েছে। পঞ্চানন মণ্ডলের বিশেষ উদ্যোগে বিশ্বভারতীর সংগ্রহে চিঠি-দলিলের সংখ্যা সহস্রাধিকে পরিণত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং এসিয়াটিক সোসাইটিতে এ ধরণের উদ্যোগ সেভাবে গৃহীত না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি-দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বিদেশে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এবং বিবলিওথেক ন্যাসিওনেলে এ ধরণের উদ্যোগ বহু পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Office Librery & Records গ্রন্থে (১৯৮১) ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি সংগৃহীত অজস্র নথির বিবরণ প্রকাশ করেছেন। দেবেশ রায় তাঁর আঠারো শতকের বাংলা গদ্য গ্রন্থে (১৯৮৭) বিবলিওথেক ন্যাসিওনেল সংরক্ষিত নথির পাঠ প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে প্যারিস প্রবাসী বাঙালি কন্যা ইন্দ্রানী রায়ের ভূমিকা ছিল বলে দেবেশবাবু উল্লেখ করেছেন। পঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতী সংগ্রহের চিঠি-দলিল-হিসাবপত্রের পাঠ প্রকাশ করেছেন চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (২য় খণ্ড, ১৯৫৩) এবং চিঠিপত্রে সমাজচিত্র (১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৮৪) গ্রন্থে। সুরেন্দ্রনাথ সেন ভারতীয় মহাফেজখানার চিঠি-দলিল-হিসাবপত্রের পাঠ প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন গ্রন্থে (১৯৪২)। শিবরতন মিত্র তাঁর রতন লাইব্রেরীর চিঠি-দলিলের পাঠ ছেপেছেন Types of Early Bengali Prose গ্রন্থে (১৯২২)। শাহজাহান মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষিত চিঠি-দলিলের পাঠ প্রকাশ করেছেন তাঁর পুরানো বাংলা দলিলপত্র গ্রন্থে (১৯৯১)।

পূর্বে উল্লিখিত সংগ্রহগুলির মধ্যে অসাঁর সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। পূর্বে যে সমস্ত বিদেশি ভারতে বাণিজ্য কিংবা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা কাজ চালাবার তাগিদেই বাংলা ভাষা শেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। হ্যালহেডের A Grammer of The Bengal Language (1778) এরকম প্রচেষ্টারই ফসল।

অসাঁও এই উদ্দেশ্যেই চিঠি-দলিল সংগ্রহ করেছিলেন এবং বিষয়ানুযায়ী তাতে দুটি গুচ্ছে ভাগ করেছিলেন। তাঁর প্রথম গুচ্ছে (৭২৫ গুচ্ছ) রয়েছে পারিবারিক চিঠিপত্র এবং দ্বিতীয় গুচ্ছে (৭২৬ গুচ্ছ) সরকারি চিঠি ও দলিল। তাঁর সংকলনের চিঠি-দলিলে বিষয় অনুযায়ী কাঠামো পরিবর্তন হয়নি বরং কাঠামো অনুযায়ীই বিষয় বিন্যস্ত হয়েছে। অসাঁর এই সংকলনের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং আমরা এর থেকে বেশ কিছু চিঠি-দলিল আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছি।

আমাদের সংকলনের সমস্ত চিঠি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে লেখা এমনটা নয়। সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন —

> বাঙ্গালা ভাষা অসহায় শৈশবেই সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতে আপনার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। (প.সং,পৃ.৮৪)

আহোম, কোচ, কাছাড়, জয়ন্তীয়া, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক চিঠিপত্র বিনিময়ে বাংলা ভাষারই ব্যবহার ছিল। আহোম রাজ্যের ভাষা হল আহোম, কাছাড়ের কাছাড়ি, জয়ন্তীয়া ও কোচ রাজ্যের ভাষা ছিল বাংলা। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্য বাংলা ছাড়া তখন আর কোন উপায় ছিল না। বলা যায় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে পূর্ব ভারতের বৃহত্তর অঞ্চলে বাংলা যথার্থ একটি যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করে।

উত্তর পূর্ব ভারতের এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিনিময়কৃত পত্রসমূহ মূলত বুরঞ্জী-গ্রন্থে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। বুরঞ্জী মানে রাজত্বের ইতিহাস। এ পর্যন্ত আহোম, ত্রিপুরা, কামরূপ, জয়ন্তীয়া, কাছাড় প্রভৃতি রাজ্যের বুরঞ্জী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আহোম বুরঞ্জী প্রথমে আহোম ভাষায় লেখা হয়েছিল কিন্তু পরে সেটি অসমিয়া ভাষায় সংকলিত হয়।

আশ্চর্যের বিষয় বুরঞ্জীগুলি অসমিয়া ভাষায় লিখিত হলেও উল্লিখিত পত্রগুলির ভাষা বাংলা। মূলত আলোচনার উদ্ধৃতি হিসাবেই পত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব চিঠির মূল ও নকল আহোম রাজাদের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হত। রাজাদেশে যখন বুরঞ্জী লেখা হত তখন এসব পত্র মূল দলিলরূপে ব্যবহৃত হত। এইজন্য একই পত্র একাধিক বুরঞ্জীতেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

এ পর্যন্ত বেশ কিছু বুরঞ্জী সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা সুধাংশু শেখর তুঙ্গ সম্পাদিত গ্রন্থ বাংলার বাইরে বাংলা গদ্যের চর্চা থেকে কয়েকটি পত্র গ্রহণ করেছি কেননা তিনি বুরঞ্জীর গ্রন্থের পাশাপাশি কিছু বুরঞ্জীর পুথিও ব্যবহার করেছিলেন।

সর্বপ্রাচীন আবিষ্কৃত বাংলা গদ্য-নথি মহারাজা নরনারায়ণের চিঠিটিও এই ধরনের নথি। যেহেতু পত্রটির মূল পাওয়া যায়নি এবং আসামবন্তি (২৭ জুন ১৯০১) পত্রিকায় পত্রটির চিত্র / সংগ্রহসূত্র অনুপস্থিত সেহেতু সুকুমার সেন প্রমুখ কিছু প্রখ্যাত গবেষক এটির অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয়ে সুধাংশু শেখর তুঙ্গের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য —

> সুকুমার সেন পত্রটিকে নির্ভেজাল বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত। প্রথমত, তাঁর মতে সপ্তদশ শতাব্দীর আগে কোনো আহোম রাজ "স্বর্গদেব" বলে উল্লেখিত হন নি। দ্বিতীয়ত, নরনারায়ণ অশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন রাজা ছিলেন ও তাঁর রাজসভা জাঁকজমকপূর্ণ ছিল — এটাই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু পত্রে বর্ণিত উপহার সামগ্রীর তালিকা থেকে রাজসভার দৈন্যদশাই প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এ দুটি যুক্তির কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। আহোম রাজাদের প্রথমাবধি উপাধি

ছিল "চাও-ফা" এবং তাঁরা নিজেরাই নিজেদের এই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই শব্দটি দুটি আহোম (তাই) শব্দের সাহায্যে গঠিত। এর "চাও" মানে আকাশ/স্বর্গ এবং "ফা" মানে দেবতা বা ঈশ্বর। কাজেই আক্ষরিক অনুবাদে "চাও-ফা" শব্দটি অসমীয়া ভাষায় "স্বর্গদেব" হয়ে গেল। ...অতএব নরনারায়ণের আমলে "স্বর্গদেব" উপাধির চল ছিল না এমন অনুমান ঠিক নয়। .... পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ ষোড়শ শতকের দিকে যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন হলেও তাঁদের রাজসভা যে বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এমন অনুমান করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। আহোমগণ অতি সাধারণভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা ইঁটের বা পাথরের বাড়ি তৈরি করতে জানতেন না, তাঁদের রাজারা প্রজাদের মত মাটির বা বাঁশের তৈরি "প্রাসাদে" বাস করতেন। .... মূল্যবান সামগ্রী নরনারায়ণ পত্র সন্দেশ রূপে প্রেরণ করেন নি .... তিনি আহোম রাজ্য দখল করবার বাসনা নিয়েছিলেন। .... কিন্তু আহোম রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য একটি অছিলা চাই। ... তাই আহোমদের অসন্তোষ উৎপাদন করবার জন্য তিনি ঐসব হীনমূল্য সামগ্রীকে উপহার হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। (গ.চ.পৃ.৪৩-৪৫)

মহারাজ নরনারায়ণ যে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আহোম দরবারে দূত পাঠিয়েছিলেন একথা ইতিহাস স্বীকৃত। অসম বুরঞ্জীতেও এই ঘটনার সমর্থন আছে।

সেহি সময় ১৪৭৭ শকত নরনারায়ণ রাজাএ পিতৃর আজ্ঞা আনুসরি আচাম দেশর ভালমন্দ জিজ্ঞাসিবর নিমিত্তে উদ্ভাণ্ড চাউলীয়া, চামরাই চাউলীয়া, কালকেতু চর্দ্দার, ধুমা চর্দ্দার, এই চারি উকীলক'র ঠাইলে ২২ ঢেঁকেরি এবে রাজা নরনারায়ণে পঠাই দিলে। সিহঁতর লগত বালিচ ১টি, কামায়ণ ধেনু ১ খান, চেঙ্গা মাছ ১টি, ঘুঁরী ২, বরণগরীয়া বিচিত্র পাটর শারী ৫ খান, লাল দৈএরে তিনিচুকীয়া সুন্দর বোয়া জাকৈ ১ খানি, ফন্দ-পত্র সহিতে দি আহিছিল।

(গ.চ.পৃ.৪৫-৪৬)

চিঠিটি সম্পর্কে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা লিখেছেন —

কথিত আছে যে, কামতারাজের প্রেরিত পত্র কালির পরিবর্তে কেঁচোর রসে লিখিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহা কেহই পাঠ করিতে সমর্থ হন নাই। দুর্গাচরণ বড় কাকতি নামক জনৈক কর্ম্মচারী রাত্রির অন্ধকারে উহা পাঠ করায় আহোমরাজ তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ পুরস্কার প্রদান করেন; আরও তাঁহার বংশধরেরা ভবিষ্যতে যে কোন অপরাধ করুন না কোন অপরাধে তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না। (কো.ই.পৃ.১০৪)

সুতরাং নরনারায়ণের এই পত্রটি কোন বিচ্ছিন্ন পত্র নয়। পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য রাজা/মন্ত্রীদের মধ্যে আদানপ্রদানকৃত কূটনৈতিক পত্রের ছাঁদ পত্রটিতে বর্তমান। আসামবস্তির লেখক/সংগ্রাহক সম্ভবত কোন বুরঞ্জীর পুথি থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই পুথিটি হারিয়ে গেছে / লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে।

গবেষণা পত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থাৎ আলোচনায় প্রত্যেকটি অংশেই প্রবণতা দেখানো হয়েছে এবং উদাহরণ সমূহের ডানদিকে সংকেত দ্বারা সেই শব্দ/বাক্যটির উৎস (অর্থাৎ কোন নথিতে আছে) নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা সমস্ত উদ্ধৃতি / উদাহরণের ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত বানান ব্যবহার করেছি।

আমরা গবেষণা পত্রটির প্রথমে প্রবেশক নামে একটি অধ্যায় যোজনা করেছি। অধ্যায়টিতে নথিগুলিতে উল্লিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ব্যক্তির পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে নথিগুলি অবলম্বনে সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। বানানরীতি (নিয়মানুসারী ও বিক্ষিপ্ত), লিখন - সংক্ষেপ রীতির প্রয়োগ, পাঠভ্রান্তি ও মঙ্গলচিহ্নের ব্যবহার বিষয়ক আলোচনা এই অধ্যায়েই সংযোজিত হয়েছে।

বর্গীকরণ অধ্যায়ে ব্যক্তিগত, সরকারি, সরকারি কর্ম সংশ্লিষ্ট, বিচারবিভাগীয়,

ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কিত ও কূটনৈতিক পত্র; বিক্রয়, দান, চুক্তি ও ঘোষণার দলিল এবং বিবিধ হিসাবপত্র বিন্যস্ত হয়েছে। হিসাবপত্র অংশে বর্গীকৃত সমস্ত নথিই মূলত তালিকা। এক্ষেত্রে বিষয় শিরোনাম অনুযায়ী খসড়া বর্গীকরণের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। প্রত্যেকটি নথির পাঠ প্রদানের পূর্বে সংকেত দ্বারা সেটির উৎস নির্দেশ করা হয়েছে এবং নথিটির বিন্যাস যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। মূলত পত্রের প্রাপক-প্রেরক সম্পর্ক, বিষয়, গদ্যের কাঠামো, স্থান ও কালক্রমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বর্গীকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ নথির ক্ষেত্রে কালক্রম অনুসরণ করা গেলেও কিছু অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ নথিকে কালক্রম ভঙ্গ করে পূর্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। একই বিষয়ের অধীন একাধিক উপবিষয় / গদ্য কাঠামোর নথিকেও কালক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা যায় নি। এখানে ব্যবহৃত আমাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের নথি (তৎসহ গ্রন্থে মুদ্রিত নথিগুলির চিত্র) যেগুলির আমরা পাঠ নির্ণয় করেছি সেগুলির চিত্র গ্রন্থশেষে বিন্যস্ত হল।

পরবর্তী অধ্যায়ে নথিগুলিতে ব্যবহৃত বিষয়ানুযায়ী নির্দিষ্ট বাক্‌বন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়েই মুক্তছাঁদের বাক্‌বন্ধ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত মিশ্রিত, আরবি পারসি প্রভাবিত এবং বিশুদ্ধ বাংলা বাক্যের ব্যবহার পাওয়া গেছে। বাংলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে লেখা নথিগুলিতে কম বেশি আরবি-পারসি শব্দের ব্যবহার দেখা গেছে। হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব নিয়ে জয়-পরাজয়ের দলিলেও বেশ কিছু আরবি ও পারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

* তিহোঁ কহিলেন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না [দ/ঘো.পত্র ঃ বেদায়া খঃ১]

* দস্তখত পরকিয়ায় ধর্ম্মের পর করিয়া দেশকে গেলেন [দ/ঘো.পত্রঃবেদায়া খঃ১]

চিঠিপত্রের সম্বোধনে মূলত কূটনৈতিক পত্রে সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলার নমুনা উপলব্ধ হয়েছে। যেমন —

* স্বস্তি সমস্ত-মস্তকমণি-তালাস্ফালন-পবন-নর্ত্তিত-প্রতাপানল-তাপিত-বৈরি-বক্ষ-স্তটক-পাতন-প্রকটিত-নরসিংহাবতার-সদামরগণ-গীয়মান-যশঃপুর-পূর্ণ-তুহিনকর-কিরণ-ধবলিতাশেষ-দিঙ্‌মণ্ডল-সৌমারেশ্বর-শ্রীশ্রীমৎ স্বর্গনারায়ণদেব মহামহোগ্রপ্রতাপ-চরিত্র-চিত্রিত-গুণ সমূহেষু —

[চি/কূট. পত্র(শ্রী.ভঙ্গ) ঃ প্রা রাজা.প্রে. রাজাঃ১]

উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলায় সারল্য এবং কিছুটা কথ্য বাকভঙ্গি পাওয়া গেছে

* এথা কুশল, তোমার রাজোন্নতি কুশল-মঙ্গল সদা বাঞ্ছা করি

[চি/কূট.পত্র(শ্রী.ভঙ্গ)ঃপ্রা রাজা.প্রে রাজা]

* এমত কার্য্য করণ চাই যেন উভয়ান প্রীতি-প্রতিষ্ঠা হয়

[চি/কূট.পত্র(কুটু)ঃপ্রা রাজা.প্রে রাজাঃ২]

এই আরবি-পারসি প্রভাবমুক্তির কারণ হল আহোম রাজারা মোগল সংস্কৃতি পছন্দ করতেন না। তাঁদের সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক ছিল (শত্রুতার। আমাদের সংকলনের একটি চিঠিতে পাই —

আর শুনিলাম তুমি মগোলর সহিত লেঢ়াই করিবার লোক লস্কর পঠায়াছা ... মগোল তোমার শত্রু আমার শত্রু আমিও লোক-লস্কর ডিমরুয়ার পথে পঠাইবার চাই, সমস্তে তৈয়ার তোমার বার্ত্তার অপেক্ষাএ মাত্র রাখিছি

[চি/কূট.পত্র(কুটু)ঃপ্রা রাজা. প্রে রাজাঃ২]

চিঠিটি জয়ন্তীয়ারাজ যশোমত্ত রায় স্বর্গদেব চক্রধ্বজসিংহকে লিখছেন। এমতাবস্থায় জয়ন্তীয়া-কাছাড়-আহোমের বাংলা যে আরবি-পারসি প্রভাবমুক্ত হতে তাতে আর আশ্চর্য কী?

ত্রিপুরার বাংলাতেও একই ধরণের সারল্য দেখা গেছে

* পরম সন্তোষে ভূমি আবাদ করিয়া রাজস্ব গণিয়া ভোগ করুক

[দ/দা. পত্র ঃ ভূমি-পাট্টা ঃ১]

বাক্যাংশটিতে সজীব অন্তরঙ্গতা বর্তমান।

ত্রিপুরার দলিলগুলিতে সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলার নমুনা পাওয়া গেছে। সংস্কৃত পত্রে যে ভাবে সুনির্বাচিত শ্রেণিবদ্ধ বিশেষণে রাজাকে সম্বোধন করার রীতি ছিল কল্যাণ মাণিক্যের নামের সঙ্গেও তদনুরূপ বিশেষণ দেখা গেছে। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন —

> ব্যবহারিক প্রয়োগ যে অনেক ক্ষেত্রেই বৈয়াকরণের রক্তচক্ষুর পরোয়া করেনা তার নজীর 'বিষম-সমর-বিজয়ী' পদের অনুসৃতিতে 'মহামহোদয়ী' পদের ব্যবহার। 'বিরাজতে-হন্যৎপরং' এর অনুসরণেই অশুদ্ধ হলেও 'রাজানামাদেশোহয়ং' প্রযুক্ত হয়েছে।
>
> (ত্রি.বা, পৃ.কুড়ি)

আবার 'শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দ মাণিক্য দেবেন দত্তং এবং ৫দ০ পাঁচ দ্রোণ বার কাণি হাসিলা দিলাম' [দ/দা. পত্রঃ ভূমি-আয়মাঃ২] প্রভৃতি বাক্যে সংস্কৃত বাংলার মিশ্রণ লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এবং শব্দটি এখানে সমগ্র অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

ধ্বনিতত্ত্ব অধ্যায়ে স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিবর্তন, পারস্পরিক প্রভাব বিদেশি ধ্বনির বঙ্গীকৃত রূপ ও পারস্পরিক প্রভাব আলোচিত হয়েছে।

রূপতত্ত্ব অধ্যায়ে রূপতত্ত্বের বিভিন্ন উপাদান (প্রত্যয়, সমাস, কারক-বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, লিঙ্গ, বচন, পদ ইত্যাদি) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দভাণ্ডার অধ্যায়ে তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, অজ্ঞাতমূল এবং মিশ্র শব্দের তালিকা প্রদান করে শব্দ ব্যবহারের (শ্রেণিগত) প্রবণতা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন বানান ও রূপে প্রাপ্ত একই শব্দকে একাধিক রূপেই বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বাক্যতত্ত্ব অধ্যায়ে ঐতিহ্যগত ব্যাকরণের সূত্র মেনে পদসংস্থান, বাক্যের রূপগত ও অর্থগত শ্রেণি, প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ বাক্য এবং বাচ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজা থেকে ভিখারি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথাই পাওয়া যাবে আমাদের সংকলনের নথিগুলিতে; সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে সেই বাংলা ভাষাকে যা বাংলার বাইরেও ত্রিপুরা, আসাম, জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ে ব্যবহৃত হত।

সুতরাং মধ্যযুগের বাঙ্গালি সংস্কৃত / আরবি-পারসি চর্চা করলেও বাংলা লিখতেন, গদ্যেই লিখতেন; যে গদ্যে পরিকল্পনা (Planning) পর্যন্ত লেখা হয়েছিল স্বচ্ছন্দ গতিতে।